বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খণ্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্প: পরিবেশ বনাম অর্থনীতি

কাশফিয়া নেহেরীন
হোমায়রা আহ্‌মেদ*

১। প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্প একটি অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পে পরিণত হয়েছে। রড, সিমেন্ট ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী, রট আয়রন, স্টীল আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র এবং আরও অনেক শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ হয় এই শিল্প থেকে। বর্তমানে এ শিল্পকে বাংলাদেশে সংগঠিত শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। ষাটের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সূচনা হয়। বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে ৭৯টি জাহাজভাঙ্গা শিল্পকারখানা। তবে বর্তমানে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে ৩৬টি নিয়মিতভাবে চালু কারখানায় গড়ে প্রতিবছর ১০ থেকে ২০টি জাহাজ ভাঙ্গা হয়।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো আইন নেই এদেশে (Rahman and Shahin 2007)। জাহাজভাঙ্গা শিল্প তদারকির জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার মেনে চলতে সহায়ক কোনো আইনগত পদক্ষেপ এবং পরিবেশগত মানদণ্ডও নেই। এমনকি জাহাজভাঙ্গার জন্য কোনো সামগ্রিক চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকারপত্রের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায় না। তবে শিল্প ও পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় আইনগুলো, যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা (১৯৯৭), শ্রম আইন (২০০৬), এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং অর্ডার অ্যাক্ট (১৯৬৫), শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রদান অ্যাক্ট (১৯২৩) ইত্যাদি এ শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

লৌহ আকরিক না থাকায় শুধুমাত্র স্টীল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ জাহাজভাঙ্গা শিল্পের ওপর শতকরা ৪০ ভাগ নির্ভরশীল। তাই এ শিল্পের অর্থনৈতিক মুনাফার বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। অথচ জাহাজ রিসাইক্লিং বা পুন:প্রক্রিয়াকরণের ফলে সৃষ্ট রাসায়নিকের মধ্যে শুধুমাত্র অ্যাসবেস্টস থেকে যে বিষাক্ত মরিচা এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিকের নি:সরণ ঘটে, তা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কাজেই যে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে, তা হল এ শিল্প দ্বারা সংঘটিত পরিবেশ দূষণের স্বল্প ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং এর কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি বা ব্যয় (Economic Cost)-এর বিষয়টি। এখানে লাভক্ষতি পর্যালোচনায় (Cost-Benefit Analysis) মূল সমস্যাটি হল এর সময়গত প্রকৃতি (Intertemporal Nature)। কারণ অর্থনৈতিক লাভ ক্ষতির

*লেখকদ্বয় যথাক্রমে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর গবেষণা সহযোগী (রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট)। এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের জন্য লেখকদ্বয় বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড: আব্দুল হাই মন্ডলের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছেন বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড: নাজনীন আহ্‌মেদ এবং রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এটিএম সাইফুলণ্ডাহ মেহেদী। তথ্য প্রদান করে সাহায্য করেছেন সাগরিকা শিপব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রির পার্টনার জনাব শামসুল আলম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার জনাব ইলিয়াস শিকদার। মো: ওয়াহেদুজ্জামান খান, রাসেল আব্দুল মজিদ এবং মোহাম্মদ আরিফ হাসানের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রবন্ধের অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির পর্যালোচনাটি পূর্ণতা পেয়েছে। বিআইডিএস-এর গবেষণা কর্মকর্তা মনোজ কুমার, শায়লা পারভীন এবং পূরবী মজুমদার ও মুদ্রাক্ষরিক আমিনা বেগম ও জনাব ইব্রাহীম খলিল বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তবে প্রবন্ধের যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলভ্রান্তির জন্য লেখকদ্বয় নিজেরা দায়ী।

বিষয়গুলো যতটা তাৎক্ষণিক (Instantaneous), পরিবেশগত এবং পরিবেশজনিত স্বাস্থ্যগত লাভ-ক্ষতির বিষয়গুলো ততটা তাৎক্ষনিক নয়। তাই এর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতীয়মান বা দৃশ্যমান লক্ষণগুলো (Instantaneously Evident) ছাড়া মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের গভীরতা (Depth) বা দিকগুলো (Dimensions) সংশিণ্টষ্ট পক্ষগুলো (Concerned Stakeholders)'র অজানা। এই পক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক, মালিক, তাদের পরিবার, এ শিল্পের উৎপাদন ব্যবহারকারী অন্যান্য শিল্প এবং সেগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিক, মালিক ও তাদের পরিবার, শিল্প-সংশিণ্টষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী, জীব ও প্রাণীজগৎ, সামুদ্রিক প্রাণী, বায়ু, পানি ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকেই এ শিল্প এবং তার অনুশীলনগুলো (Practices) দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবের কিছু তাৎক্ষণিক, কিছু মধ্যমেয়াদি, কিছু আবার বেশ কয়েক বছর পর দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দিক থেকে এর অর্থ মূল্য (Monetary Value) নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। আর তাই পরিবেশগত ক্ষতির আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক চিত্রে আপাত বিশাল অংকের অর্থনৈতিক ছাড় দেওয়াও স্বভাবত:ই বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে মুশকিল।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প মূলত স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিকাশ লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে তাইওয়ান, ক্যাম্বোডিয়া, ভারত, পাকিস্ড়ান ও বাংলাদেশের কথা উলেণ্টখ করা যায়। ব্যতিক্রম হিসেবে রয়েছে তুরস্ক, যে দেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage) পেয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ শিল্পের বিকাশ লাভের মূল কারণ হলো সুলভ শ্রম (Cheap Labour) এবং পরিবেশ প্রশ্নে এ দেশগুলোর ছাড় দেবার মনোভাব (Flexibility)। উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বর্জ্য পদার্থ স্থানান্ড়রের একটি সহজ মাধ্যম হিসেবে এ শিল্পকে বেছে নিয়েছে, যা ঐ দেশগুলোর অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে গিয়ে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে (McElroy 2006)। নিজের দেশের পরিবেশকে বিষমুক্ত রাখার জন্য তারা পুরোনো বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ জাহাজগুলোকে নিজেদের দেশে না রেখে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই পরিবেশের উপর প্রভাবের মানদ"ে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের আর্থ-সামাজিক লাভ-লোকসান নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন (Nosal and Wilhelm 1990)।

দ্বিবিধ কারণে এ শিল্প প্রকৃতিগতভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে, একটি জাহাজ একটি শহরের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই প্রথমত একদিকে যেমন জাহাজের বর্জ্য একটি মহানগরীতে নাগরিক বসবাসের ফলে সৃষ্ট সকল আবর্জনার একটি ক্ষতিকারক ঘনায়িত রূপ (concentrated form), অন্যদিকে তমনি ক্ষতিকারক সীসার আবরণে আবৃত জাহাজগুলো মানবদেহে দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমণ করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে এই শিল্প অত্যন্ড় বেশি মাত্রায় শ্রমঘন (Labour Intensive) বলে (ভারী যন্ত্রপাতিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে) এ শিল্পে অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক। ফলে এ শিল্পের সাথে শ্রমিক ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই শ্রমিকদের দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যাখ্যা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ এ শিল্পের পেশাগত ঝুঁকির (Occupational Risks) মারাত্মক মাত্রার কারণেই। আর এ কারণেই জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সামগ্রিক প্রভাব পর্যালোচনায় পরিবেশগত প্রভাব, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং যাবতীয় লাভ-ক্ষতি পর্যালোচনার বিষয়টি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। Young Power in Social Action (YPSA) বা 'ইপসা' নামক একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত ৪০০ এর বেশি শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং ৬০০ জনের মতো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে একজনের মৃত্যু

হয় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয় একজন। তবে এ হিসাব শুধুমাত্র নথিভুক্ত ক্ষয়ক্ষতির (Reported Casualty) হিসাব দেয়। বহু শ্রমিকের স্বাস্থ্যগত, দুর্ঘটনাজনিত ও প্রাণঘাতি ক্ষয়ক্ষতির তথ্য নথিভুক্ত হয় না। তাই Butler and Worral (1991) শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি (Occupational Risk) এবং শারীরিক ক্ষতির নিরীখে একটি দীর্ঘ এবং নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যাখ্যার উপর অত্যন্ড় গুর"ত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, প্রতিষ্ঠানগুলোর এ বিষয়ে লাভ লোকসানের একটি বিশেষ পর্যালোচনা করা উচিত, কেননা শিল্পের সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির অংকে শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান প্রবন্ধে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Impact) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা (Occupational Health and Safety) সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি পর্যালোচনা করলে কেবল আর্থিক ব্যাপারটির একটি তুলনামূলক চিত্র উঠে আসে কিন্তু পরিবেশের ওপর প্রভাব বা শ্রমিক নিরাপত্তার সামাজিক রূপ ও প্রকৃত তথ্য প্রমাণ উঠে আসবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই বর্তমান গবেষণাটিতে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার প্রয়াস থাকবে।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য দুটি: প্রথমত, শ্রমিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সংরক্ষণজনিত বিদ্যমান আইনসমূহ এবং এই আইনসমূহের প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং দ্বিতীয়ত, পরিবেশ ও শ্রম-অধিকার নিশ্চিতকরণ আইনগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক লাভ-ক্ষতির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।

২। জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সরিত পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য পদার্থসমূহ এবং এই বর্জ্য পদার্থসমূহ হতে উদ্ভূত সমস্যা ও ক্ষতির ব্যাপ্তি

২.১। জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সরিত পরিবেশ দূষণকারী রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থসমূহ

পরিবেশ এবং মানবস্বাস্থ্যের ওপর জাহাজভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য এ শিল্পের অবশ্যম্ভাবী বর্জ্য পদার্থসমূহ, যা পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য এবং শ্রমিক নিরাপত্তা উভয়ের উপরই প্রভাব ফেলে, সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সমুদ্রগামী জাহাজ ভাঙ্গার সময় কঠিন, তরল ও বায়বীয় ধাতব এবং অধাতব দূষিত পদার্থ তৈরি হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে:

- দীর্ঘস্থায়ী জৈবিক পদার্থ (পিওপি)
- পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল কমপাউন্ডস্ (পিসিবি)
- অ্যাসবেস্টস
- অর্গানোটিনস্
- তেল
- ট্রাইবিউটাইলিন (টিবিটি)
- ভারী ধাতু, যেমন: পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্ড়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত সব পদার্থই রাসায়নিক বর্জ্য, যা দীর্ঘ সময় পর্যন্ড় পরিবেশে থেকে যায় এবং ক্রমান্বয়ে বিস্ড়ীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্ড়ৃত হয়। এগুলো প্রাকৃতিক খাদ্য-শৃঙ্খলে অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে জৈবিক ভাবে সঞ্চিত হয় এবং তাদের মেদকলায় (Fat Tissue) জমা হয়ে জীবজগতের জন্য ঝুঁকিতে পরিণত হয়। মানব দেহে এগুলো হরমোনগত সমস্যা থেকে শুর" করে অনিরাময়যোগ্য ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এসব নিয়ে খুবই নাজুক অবস্থায় থাকে, কেননা এই দেশগুলো প্রায়ই এসব POP (Persistant Organic Pollutants)-এর আবর্জনা ফেলবার জায়গা (Disposal) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment or DoE) থেকে ৪৮৪টি ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও জৈব রাসানিক বর্জ্য পদার্থ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ভাঙ্গার জন্য আনা পুরান জাহাজ থেকে অপসারিত হয়। এই পদার্থগলোর প্রতিটি পরিবেশ, জীব ও মানুষের জন্য অত্যন্ড় ক্ষতিকর। এই পদার্থগুলোর মধ্যে তৈল, যা জাহাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় (ব্যালাস্ট ওয়েল (Ballast Oil), এর সংস্পর্শে শ্রমিকদের এবং পারিপার্শ্বিক জীব ও জড় জগৎকে অবধারিতভাবে আসতে হয়। অন্য সব বর্জ্যের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই দূষিত তেলের প্রভাব যদি পরিবেশের উপর আলোচনা করা যায়, তবে এ শিল্প হতে নিঃসরিত বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

২.২। সামুদ্রিক জীবের উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নিঃসরিত পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য পদার্থসমূহের প্রভাব

পরিত্যক্ত জাহাজভাঙ্গা থেকে নি:সরিত বিষাক্ত ও দূষিত তেল যেসব জীবের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেগুলো হলো: (ক) সামুদ্রিক পাখি, (খ) সামুদ্রিক স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী, (গ) মাছ, কচ্ছপ এবং (ঘ) সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব।

ক) সামুদ্রিক পাখি

সামুদ্রিক বিভিন্ন ধরনের পাখি সমুদ্র তীরবর্তী স্থানসমূহে সাঁতার কেটে বা বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। তাদের দিনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করে। এসময়ে তারা এ জাতীয় বিষাক্ত তেলের সান্নিধ্যে এসে নানা রোগের শিকার হতে পারে। এমনকি এ জাতীয় বিষাক্ত তেলের বিষক্রিয়ায় তাদের মৃত্যুও হতে পারে। পালকওয়ালা জীবের দূষিত তেল এর সান্নিধ্যে আসার অন্যান্য যে সমস্যাগুলো ঘটতে পারে তা হলো লিভার, ফুসফুস, কিডনী, অগ্নাশয় এবং অন্যান্য অভ্যন্ড়রীণ অঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়, লোহিত রক্ত কনিকার ধ্বংস, ডিম পাড়তে বিভিন্ন অসুবিধা ও কম সংখ্যক ডিম পাড়া, ডিমের উর্বরতা হ্রাস পাওয়া, ডিমের খোলস যথেষ্ট শক্ত না হওয়া, ডিমে তা দিতে সমস্যা হওয়া ইত্যাদি (Foster and Wittman 1981)।

খ) সামুদ্রিক স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী

Foster ও Wittman দূষিত তেলের সংস্পর্শে আসা সামুদ্রিক বিভিন্ন স্ড়ন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে যে সমস্ড় সমস্যা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো: হাইপোথারমিয়া এবং আলসারসহ বিভিন্ন মারাত্মক

রোগের উচ্চ প্রবণতা, হজমে সমস্যা হওয়া, শরীরের বিভিন্ন স্থান বিষাক্ত হয়ে যাওয়া, অভ্যন্ড়রীণ রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

গ) মাছ, কচ্ছপ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব

জাহাজভাঙ্গা প্রক্রিয়া থেকে নি:সরিত দূষিত তেল যখন অগভীর পানিতে ভাসতে থাকে তখন সামুদ্রিক মাছের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। মাছের ডিম, লার্ভা, পোনা এ জাতীয় তেল থেকে সংঘটিত ক্ষতির সাথে অত্যন্ড় সংবেদনশীল। সমুদ্রের মাছ যখন এই দূষিত তেল গ্রহণ করে, তখন সেই তেল মাছের গলবণ্ঢাডার, কিডনী, পাকস্থলী ইত্যাদিতে গিয়ে জমা হয়। যদিও অনেক সময় তেলের দূষণ এর ফলে মাছের মধ্যে যে বিষক্রিয়া সংক্রমিত হয় তা কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরে ঠিকও হয়ে যেতে পারে তবুও এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মাছ গ্রহণ করা হলে, তা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে (Islam and Hossain 1986)। মাছের মতো সামুদ্রিক অন্যান্য জীব, চিংড়ি ইত্যাদির বিভিন্ন বিষাক্ততা থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে। তবে এই ক্ষমতা কার্যকর হয় যখন বিষাক্ততা অত্যন্ড় কম পরিমাণের হয় বা দূষণের কারণ বা উৎস (এক্ষেত্রে জাহাজভাঙ্গা শিল্প) বসবাসের স্থান হতে অপসারিত হয়। দূষিত তেল হতে উদ্ভূত বিষ ক্রিয়ার প্রভাবে সামুদ্রিক কচ্ছপেরও নানা সমস্যা হয়। দূষিত তেল গ্রহণ করার ফলে কচ্ছপের হজমে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং চামড়াতে সমস্যা হয়। তাছাড়া অন্যান্য অভ্যন্ড়রীণ অঙ্গে যেমন শ্বাসতন্ত্রে ক্ষতি হয়, ফুসফুস এবং চোখে সমস্যা দেখা দেয়। কচ্ছপের ডিমে সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ড় তৎপর, কেননা বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে।

ঘ) সামুদ্রিক উদ্ভিদ

জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নিঃসরিত বিষাক্ত তেল সামুদ্রিক বিভিন্ন উদ্ভিদ যেমন কেল্প, সামুদ্রিক ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিদের (Vegetation) ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া এ শিল্পের ফলে আশেপাশের এলাকার মাটি, পানি ও বায়ুতে দূষণ ঘটে, যা সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং পুরো সামুদ্রিক পরিবেশকেও ক্ষতিগ্রস্ড় করে।

২.৩। জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সরিত দূষণকারী রাসায়নিক বর্জ্য হতে মাটি ও পানি দূষণের ব্যাপ্তি

Islam and Hossain (1986) সমুদ্র তীরবর্তী মাটির ফিজিওকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্যের উপর, বিশেষ করে ধাতুর উপস্থিতির উপর একটি গবেষণা করেছেন এবং তাদের নমুনা এলাকা ছিল ফৌজদারহাট ও কুমিরা এলাকা। ধাতুর উপস্থিতির উপর গবেষণা কোনো এলাকার দূষণের ধারা জানতে সাহায্য করে (Foster and Wittman 1981)। এই গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য যে পরিমাণ অ্যামোনিয়া ক্ষতিকর সেই পরিমাণ অ্যামোনিয়া (অত্যন্ড় বেশি p^Hসহ) পাওয়া গেছে সমুদ্র সৈকতের মাটি ও পানিতে। Siddiquee (2004) তাঁর একটি গবেষণায় কিছু ট্রেইস উপাদান বা ধাতু পেয়েছেন যাদের উপস্থিতি সমুদ্র তীরবর্তী জাহাজভাঙ্গার স্থানে অত্যন্ড় বেশি। ধাতুগুলো হলো ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, পারদ, কপার ইত্যাদি। এই সমস্ড় গবেষণাতে আদর্শ অনুপাতের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে এসব ধাতু পাওয়া গেছে। এই তথ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে জাহাজভাঙ্গা কর্মকা সমুদ্র তীরবর্তী মাটি এবং পানিকে দূষিত করেছে ব্যাপকভাবে যা অত্যন্ড় বিপদজ্জনক পরিস্থিতির জানান দেয়।

২.৪। মানবস্বাস্থ্যের উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সৃত পরিবেশ দূষণকারী রাসায়নিক বর্জ্যের প্রভাব

মানবদেহের উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সরিত বর্জ্য পদার্থসমূহ নানারকম ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে। এই শিল্প হতে নিঃসরিত প্রতিটি উপাদানের স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। কেননা এই আলোচনা হতে এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে যেসব দূষিত রাসায়নিক পদার্থ অবধারিতভাবে নি:সৃত হয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো অ্যাসবেস্টস (Asbestos)। শ্রমিকরা অ্যাসবেস্টস তন্তুকে নি:শ্বাসের সাথে গ্রহণ করে দিনের পর দিন যা ধীরে ধীরে তাদের ফুসফুসের ঝিলিণ্ডর চারদিকে ক্ষতিগ্রস্ড় টিস্যুর (Tissue) আবরণ তৈরি করে। একে বলা হয় পিণ্ডউরাল পণ্ডাকস্ (Pleural plaques)। এই টিস্যু স্বাভাবিক ফুসফুস টিস্যুর (Lung Tissue) মতো আচরণ করে না। ফলে মানবদেহের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System) বাধাগ্রস্ড় হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে পড়ে, ফুসফুসে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সংঘটিত হয়ে হৃৎপিন্ড বৃহদাকার ধারণ করে। এটি অ্যাসবেস্টোসিস (Asbestosis) নামক একটি মারাত্মক রোগ, যা ক্রমান্বয়ে মানুষকে বিকলাঙ্গতা বা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় (Green Peace 2001)।

অ্যাসবেস্টসের দীর্ঘ সংস্পর্শে এলে দু'ধরনের ক্যান্সারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। একটি হলো ফুসফুসের টিস্যুর ক্যান্সার এবং অন্যটি হলো মেসোথেলিওমা (Mesothelioma), যা হলো ফুসফুসের চারদিকে ঘিরে থাকা ঝিলিণ্ডর ক্যান্সার। দ্বিতীয় ধরনের ক্যান্সার অভ্যন্ড়রীণ অন্যান্য অঙ্গকেও ক্ষতিগ্রস্ড় করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অ্যাসবেসটসের সংস্পর্শে আসা শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যারা অ্যাসবেসটসকে নি:শ্বাসের সাথে গ্রহণ করে, তাদের পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় এবং কিডনিতে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

জাহাজের বিভিন্ন অংশে ভারী ধাতু যেমন- পারদ (Mercury), সীসা (Lead), আর্সেনিক (Arsenic), ক্রোমিয়াম (Cromium), ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), দস্ড়া (Zinc) ইত্যাদির অস্ড়িত্ব বিদ্যমান। এগুলোর সংস্পর্শে দীর্ঘমাত্রায় এলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে, অন্যদিকে তেমনি এগুলো বায়ু, পানি ও মাটিতে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয়ে পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতি করে। যেখানে মাটিতে পারদ থাকার কথা শুধুমাত্র ০.১ মিলিগ্রাম/কেজি, সেখানে চট্টগ্রামের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের স্থানগুলোতে এর পরিমাণ ০.৮ থেকে ৩.০ মিলিগ্রাম/কেজি। যখন মানুষ মিথাইল পারদ (CH_4Hg) দ্বারা দূষিত বিভিন্ন ধরনের মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখন তারা স্নায়ুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলাজনিত মিনিমাটা রোগ (Minimata disease)-এ আক্রান্ড় হয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। পারদ মানসিক এবং শারীরিক বিকলাঙ্গতার কারণও হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ভয়টা আরও বেশি। এমনকি কম পরিমাণে হলেও বেশি সময় ধরে পারদের সংস্পর্শ স্থায়ী বিকলাঙ্গতার জন্ম দেয় (Rivera, Cortes-Maramba and Akagi 2003)।

চট্টগ্রামের জাহাজভাঙ্গা শিল্প এলাকার মাটি পরীক্ষা করে ৪২৩২ থেকে ৫৭৩৩ মিলিগ্রাম/কেজি সীসার উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে (DNV 2001)। নি:শ্বাসের সাথে বা অন্য কোনোভাবে এই পদার্থ গ্রহণ করা হলে এই বিষাক্ত লেড রক্ত এবং বিশেষত হাঁড়ে পুঞ্জীভূত হয়। দীর্ঘদিন এর সংস্পর্শে থাকলে

মস্তিষ্ক ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রক্তচাপ বেড়ে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে সীসার প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। কেননা এই পদার্থ গ্রহণে শিশুর ক্ষেত্রে যেসব ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয় তার মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক বিকলাঙ্গতা, কানে কম শোনা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অভাব ইত্যাদি যা একটি শিশুর পুরো ভবিষ্যৎ জীবনকে পঙ্গু করে দেয়।

হিউম্যান কারসিনোজেন (Human Carcinogen) হিসেবে পরিচিত আর্সেনিক হলো জাহাজভাঙ্গা শিল্প থেকে নিঃসৃত আরেকটি মারাত্মক বিষাক্ত ভারী ধাতু। এটি ফুসফুস, ত্বক, পাকস্থলী ও কিডনির ক্যান্সার ঘটায়, রক্তকণার ক্ষতিসাধন করে, স্নায়ুকোষ ও কলার প্রদাহ ঘটিয়ে প্যারালাইসিস তৈরি করে।

মাত্র সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম (০.০০০৩ মিলিগ্রাম/কেজি থেকে ০.০০০৭ মিলিগ্রাম/কেজি) মানবদেহের চর্বি, গণ্ডুকোজ, কোলেস্টেরল বিপাকে সাহায্য করে। অথচ জাহাজভাঙ্গা শিল্প এলাকার মাটিতে ৫০৭ মিলিগ্রাম/কেজি থেকে ৫৬৮ মিলিগ্রাম/কেজি পর্যন্ত ক্রোমিয়াম পাওয়া গিয়েছে (সারণি ১)। এই পরিমাণ আদর্শ পরিমাণের (১৪৪ মিলিগ্রাম/কেজি) প্রায় চারগুণ। অধিক পরিমাণে ক্রোমিয়াম যকৃত, কিডনি ও ত্বকের বিভিন্ন ক্ষতিসাধন করে এবং হাঁপানী সৃষ্টি করে (Carson, Ellis, and McCann 1987)। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে, চট্টগ্রাম জাহাজভাঙ্গা শিল্প এলাকায় অন্যান্য ভারী ধাতুর অস্তিত্বও আদর্শ পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি। ফলে এসব ভারী ধাতু থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক বর্জ্যের মারাত্মক প্রভাব মানবস্বাস্থ্যের ওপর পড়ে। যদিও এর প্রকৃত স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, তবু এ ধাতুগুলোর (শুধুমাত্র পারদ বাদে) আদর্শমানের চাইতে কয়েকগুণ বেশি বিদ্যমান থাকা জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে স্বাস্থ্যহানিকর প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

সারণি ১

চট্টগ্রাম জাহাজভাঙ্গা শিল্প এলাকায় ভারী ধাতুর পরিমাণ

ধাতু	আদর্শ মান (মিলিগ্রাম/কেজি)	বিদ্যমান (মিলিগ্রাম/কেজি)
তামা	৫১	৫৭৩ থেকে ১২১১
পারদ	০.৫	০.০৭৬-০.২৬৬
ম্যাঙ্গানিজ	১৩১৩	১৭৯২-২৩২১
দস্তা	১৪৪	২৯২৯-৫৮৫৮
ক্রোমিয়াম	১৪৪	৫০৭-৫৬৮

উৎস: বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত (প্রবন্ধ তালিকা গ্রন্থপঞ্জিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে)।

খুব অল্প সময় ধরে অনেক বেশি পরিমাণ বিষাক্ত জৈবিক বর্জ্যের সংস্পর্শে থাকলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে মুখমন্ডল ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গের নাজুক অবস্থা সৃষ্টি ও চুলকানি, অস্থিরতা, মাথা ঘোরানো, শরীরের ভারসাম্যহানি, কাঁপুনি, মানসিক স্থবিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদি। কোনোভাবে তা খাদ্য বা ত্বকের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করলে দেখা দেয় পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহজনিত বমি (বমন) ও ডায়রিয়া। সবচেয়ে মারাত্মক বিষক্রিয়ার ফলে দেখা দেয় পেশীর খিঁচুনী (Generalized Convulsions)। বেশি মাত্রায় এ সব বর্জ্যের প্রভাব রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয় ও হৃৎপিন্ডের প্রদাহ সৃষ্টি করে, যা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াতে (Cardiac Arrythmia) পরিণত হতে পারে।

ফলে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে অসুবিধা হয় এবং শেষ পর্যন্ড় কোমায় চলে যেতে পারে (Green Peace 1999)।

প্রাণঘাতি প্রভাব ছাড়াও বেশ কিছু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে যার লক্ষণ পরবর্তীতে প্রকাশ পায়। দীর্ঘস্থায়ী জৈবিক বর্জ্য বা POP'র প্রভাব নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর বেশি পড়ে। দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী জৈবিক বর্জ্যের ফলে গর্ভপাত, বিলম্বিত গর্ভধারণ, ত্রুটিযুক্ত শিশুর জন্ম এবং শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ্যালড্রিন এবং ডিয়েলড্রিন এর কারণে প্রজনন ক্ষমতা ও কর্মশক্তি হ্রাস পায়। মাইরেক্স এবং টক্সাফেন ছাড়া বাকি দীর্ঘস্থায়ী জৈবিক বর্জ্য জীব কোষের রূপান্ড়র ঘটায়। কীটপতঙ্গ মূলত শক্তিশালী হয় আরসিনোজেনসের কারণে। ক্লোরডেন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর, অ্যালড্রিন ও ডিয়েলড্রিন এর কারণে লিভার ক্যান্সার হয়। ডিডিটি এর ফলে স্ড়নে এবং ডিয়েলড্রিন এর কারণে এ্যাড্রেনাল গণ্ড্যান্ডসে ক্যান্সার হয়। এর মাধ্যমে অসংখ্যায়ু প্রভাবিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ড় হয় লিভার ও রেনাল, এনজাইমের বৃদ্ধি (ড্রাগস বা অন্যান্য উপাদানের কারণে দ্রুত বৃদ্ধি পায়) ঘটে লিভারে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, বিণ্ঢফারিটিস, রেটিনাল অ্যানজিওপ্যাথি এবং এলার্জিজনিত চোখের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া হেপ্টাক্লোর এর প্রভাবে অমনোযোগী মনোভাব দেখা দেয় এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে (Carson, Ellis, and McCann 1987)।

৩। বাংলাদেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য আইনগত কাঠামো

জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে শিল্প বলা হলেও এটি তৈরি পোশাক শিল্পের বা চিনি শিল্পের মতো এখনো কোনো রীতিসিদ্ধ শিল্প নয়। যেহেতু জাহাজভাঙ্গা শিল্প অন্যান্য রীতিসিদ্ধ শিল্প যেমন রড তৈরি, স্টীল রি-রোলিং মিল ইত্যাদির সাথে জড়িত সেহেতু জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আইনগত কাঠামো গঠন করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। আইনগত কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে দুটো বিষয় অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি হলো মানুষ এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো পরিবেশ। উলেণ্ঢখ্য যে, কিছু জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক নিয়মকানুন বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

প্রধান প্রধান আন্ড়র্জাতিক আইনগত কাঠামোগুলো হচ্ছে (Alam 2005):

১. আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্যে কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও পেসটিসাইড্স সংক্রান্ড় "পূর্বে অবগত অনুমতি" (Prior Informed Consent (PIC)) বিষয়ক রোটারড্যাম কনভেনশন

২. দূষিত বর্জ্য অপসারণ ও তাদের স্থানান্ড়রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যাসেল কনভেনশন, ১৯৮৯

৩. জাহাজ রিসাইক্লিং এর উপর ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম অরগানাইজেশন বা আইএমও (IMO) নির্দেশিকা, ২০০৩

৪. আন্ড়র্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labor Organization, ILO) বা আইএলও কনভেনশন

৫. লন্ডন কনভেনশন

এই আইনগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত হলো।

৩.১। রোটারড্যাম কনভেনশন

ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পেসটিসাইড দ্বারা সংঘটিত সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য ১৯৮০ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (United Nations Environment Programme or UNEP) এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (Food and Agricultural Organization or FAO) যৌথভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব পদার্থের আমদানি ও ব্যবহারের বিষয়ে কিছু বিধিমালা প্রণয়ন করে। এই বিধিমালা ও তথ্য আদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিগুলোই ১৯৮৯ সালে পূর্বে অবগত অনুমতি বা Prior Informed Consent (PIC) নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ এ বিধিমালায় স্বাক্ষর করে। PIC হলো ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি কার্যকরী হওয়া রোটারড্যাম কনভেনশনের মূল ধারা। রোটারড্যাম কনভেনশন এর "পূর্বে অবগত অনুমতি "বা PIC তে ৩০টি ক্ষতিকর পেসটিসাইড্স এবং ১১টি শিলা সংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থের কথা বলা আছে। এর মধ্যে অলড্রিন (aldrin), ক্লোরডেইন (chlordane), ডিএনওসি (DNOC) ও এর লবণসমূহ অন্যতম পেসটিসাইড্স এবং অ্যানথোফাইলাইট (anthophyllte) অ্যাসপেটস ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ অন্যতম।

এই আইন অনুসারে জাহাজের মালিকদের ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আনার পূর্বে ঐ জাহাজে বিদ্যমান ক্ষতিকর বর্জ্য সম্পর্কে ঘোষণা দিতে হবে। অবশ্য "পূর্বে অবগত অনুমতি" আইন ঝুঁকিপূর্ণ জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে না। এটি একটি অপরিহার্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা মাত্র। পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলো পরিত্যক্ত জাহাজ আমদানিকারক দেশগুলো কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.২। ব্যাসেল কনভেনশন (১৯৮৯)

ব্যাসেল কনভেনশন বাংলাদেশ এবং ভারতসহ ১৬৬টি দেশ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই কনভেনশনের লক্ষ্য হলো মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে রক্ষা করা এবং বিষাক্ত বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা। যে দুটি ভিত্তির উপর ব্যাসেল কনভেনশন প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো:

- ক্ষতিকারক বর্জ্যের আন্তঃসীমা স্থানান্তরের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, যার লক্ষ্য হলো ক্ষতিকারক বর্জ্যের আন্তঃসীমা স্থানান্তর কমানো এবং বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। তাছাড়া বর্জ্যের পরিমাণ কমানোও একটি লক্ষ্য।
- ব্যাসেল কনভেনশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাহাজের মালিকগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জাহাজের আয়ু শেষের পর করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে বাধ্য থাকবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য আবেদন করতেও তারা বাধ্য থাকবে। এই কনভেনশন অনুযায়ী যে ব্যবস্থার মাধ্যমে জাহাজভাঙ্গা হবে সেটি পরিবেশবান্ধবভাবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনায় সক্ষম কিনা তা পরীবিক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। যদি পরিবেশ বান্ধবভাবে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের কোনো প্রকার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে উন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বর্জ্য পদার্থ স্থানান্তরকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

৩.৩। লন্ডন কনভেনশন

সামুদ্রিক দূষণ সংক্রান্ড় অন্যতম সন্ধিপত্র হলো লন্ডন কনভেনশন। লন্ডন কনভেনশন অনুসারে জাহাজভাঙ্গার শিল্প হতে নি:সরিত বর্জ্য নিষ্কাশনের সময় কর্তৃপক্ষকে সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লন্ডন কনভেনশন অনুযায়ী একটি প্রাথমিক আবশ্যকতা হলো, জাহাজ থেকে সমুদ্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জ্য নি:সরণ চলবে না। যেহেতু লন্ডন কনভেনশন কেবল সমুদ্রের দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এতে পরিবেশের অন্যান্য ক্ষতি প্রতিরোধের কোনো উলেণ্ঢখ নেই, সেহেতু জাহাজভাঙ্গা শিল্পে লন্ডন কনভেনশনের প্রয়োগ কিছুটা বিতর্কিত। তবে যখন এই কনভেনশন ঠিক করা হয়েছিল, তখন জাহাজভাঙ্গা শিল্পের ব্যাপারটি এতবড় সমস্যা ছিল না ।

৩.৪। ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম অরগ্যানাইজেশন নির্দেশিকা, ২০০৩

জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াকরণের উপর দেয়া আন্ড়র্জাতিক ম্যারিটাইম প্রতিষ্ঠান (IMO)-এর নির্দেশিকা গৃহীত হয়েছিল ২০০৩ সালের ৫ ডিসেম্বর। ঐদিন থেকেই আইএমও দিকনির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। এই সংস্থা সারা বিশ্বের জাহাজ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে কাজ করে থাকে। ১৬৬টি আন্ড়র্জাতিক সংস্থার সাথে আইএমও জাহাজভাঙ্গা শিল্পের উপর কাজ করে আসছে ১৯৯৯ সাল থেকে এবং যে সকল বিষয়ে কাজ করে থাকে সেগুলো হলো জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা, জাহাজ শিল্পের ঝুঁকি মুক্ত করার লক্ষ্যে সবুজায়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণে সহযোগিতা করা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়।

৩.৫। আইএলও (ILO) কনভেনশন

আন্ড়র্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labor Organization, ILO) বা আইএলও ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্ক ও কয়েকটি নির্বাচিত এশীয় দেশে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং কর্মস্থলে কাজ করার সময় বিভিন্ন রোগ ও দুর্ঘটনা প্রবণতা রোধের জন্য 'জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য: এই বিষয়ে নির্দেশনা শুধুমাত্র এশিয়ান দেশসমূহ এবং তুরস্কের জন্য' শীর্ষক একটি আন্ড়:আঞ্চলিক সভার আয়োজন করে। এই সভায় শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকারী বেশ কয়েকটি নীতিমালা গৃহীত হয়।[১]

এতো গেল আন্ড়র্জাতিক আইনি কাঠামো। বাংলাদেশে যেসব আইন এই শিল্পের জন্য প্রযোজ্য, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা এবং কিছু আইন ও নীতি। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহ কর্তৃক এসব নিয়ন্ত্রণমূলক বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের

---

[১] আইএলও (ILO) কনভেশন-এর সাথে সম্পর্কিত জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কার্যসমূহ নিম্নরূপ-

- কনভেনশন ৮৭, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কনভেনশন, ১৯৪৮ (বাংলাদেশ কর্তৃক সমর্থিত)
- কনভেনশন ১, কর্মদিবস (শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে), ১৯১৯ (ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃক সমর্থিত)
- কনভেনশন ১৮, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ (পেশাগত কারণে সংঘটিত অসুখ/রোগ) কনভেনশনসমূহ, ১৯২৫ এবং ১৯৩৪ (ভারত এবং বাংলাদেশ কর্তৃক সমর্থিত)
- কনভেনশন, ১১৮ সমতা / সাম্য আচরণ কনভেনশন (সামাজিক নিরাপত্তা-এর ক্ষেত্রে), ১৯৬২ (বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক সমর্থিত
- কনভেনশন ১৪৮, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কিত কনভেনশন (বায়ু, দূষণ, শব্দ এবং কম্পন), ১৯৭৭
- কনভেনশন ১৫৫, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কনভেনশন, ১৯৮১
- কনভেনশন ১৬১, পেশাগত স্বাস্থ্য সেবা কনভেনশন, ১৯৮৫
- কনভেনশন ১৭০, রাসায়নিক কনভেনশন, ১৯৯০

পরিবেশ বিভাগ থেকে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য পরিবেশবান্ধব নিয়ম নীতি সম্পর্কিত প্রাপ্ত নির্দেশিকাসমূহ হলো:

ক. জাহাজের বর্জ্যের পচন প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন,

খ. বর্জ্য পদার্থের তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন,

গ. জ্বালানি, তেল জাতীয় ও অন্যান্য তরল পদার্থ পরিষ্কারক বা অপসারণের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য,

ঘ. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ,

ঙ. সর্বত্র নিরাপদ বিচরণ, কম্পার্টমেন্টস, ট্যাংক ইত্যাদি স্থানে/জায়গায় শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ,

চ. গরম পরিবেশে কাজের ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেমন- পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বায়ু প্রবেশের সুযোগ করা, বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ অথবা উচ্চ দাহ্য ব্যবহার করে রঙ অপসারণ করা এবং যে কোনো গরম পরিবেশে কাজ করার পূর্বে সেই পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা,

ছ. অ্যাসবেসটস, পিসিবি জাতীয় পদার্থ যেগুলো স্বাস্থ্যের উপর ঝুঁকি বাড়ায় সেগুলো অপসারণ করা,

জ. জাহাজ টুকরো করার যে কাজগুলো বাংলাদেশের জাহাজ শিল্পের মালিকরা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় করে, সে কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করা, এবং

ঝ. সংরক্ষণ, পুন:প্রক্রিয়াকরণ, পরিত্যাগকরণ ইত্যাদি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

জাহাজভাঙ্গার পূর্বে বিশেষ করে জাহাজ উষ্ণ[১] করার পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment)-এর কাছ থেকে নেওয়া উচিত। একেকটি জাহাজের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র হিসেবে কমলা-ক ক্যাটাগরি (orange-ka-category) প্রদান করে এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড-এর ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় লাল ক্যাটাগরি (Red category)। লাল ক্যাটাগরিতে ছাড়পত্র পাবার জন্য যেসব বিষয় নিশ্চিত করতে হয় সেগুলো হলো:

ক. প্রত্যেক জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড অথবা কিছু ইয়ার্ডে তেল ধারণ করার জন্য যন্ত্র আছে কিনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য রাখার ও পরিত্যাগ করার সুবিধা আছে কিনা;

খ. যেকোনো দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক ইয়ার্ডের নিজস্ব অথবা সাধারণ (ommon) অগ্নিনির্বাপক এবং নিরাপদ যন্ত্র আছে কিনা; এবং

গ. প্রত্যেক ইয়ার্ডের ফাস্ট এইড-এর সুবিধা আছে কিনা।

এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর দ্বারা নিয়মিতভাবে জাহাজভাঙ্গা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়াও যেসব জাতীয় আইন ও নীতিমালা জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য প্রযোজ্য তা হল:

১. ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট, ১৯৬৫; বাংলাদেশ শ্রমিক আইন, ২০০৬

[১] জাহাজভাঙ্গার পূর্বে জাহাজের অংশবিশেষ কাটার বা ভাঙ্গার সুবিধার জন্য একে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উষ্ণ করে নেওয়া হয়।

২. পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪

৩. পেট্রোলিয়াম নীতি, ১৯৩৭

৪. বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষা/প্রতিরক্ষা আইন (১৯৯৫)

৫. পরিবেশ রক্ষা নীতি (১৯৯৭)

৬. এ্যামপণ্ডয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং অর্ডার অ্যাক্ট (১৯২৩)

৭. শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ অ্যাক্ট (১৯২৩)

৮. অন্যান্য মানবাধিকার সংরক্ষণমূলক দায়িত্ব ও নীতি

উপরোক্ত আইন ও নীতিমালাগুলো মূলত শ্রমিকের অধিকার যেমন, ন্যূনতম মজুরি, কর্মক্ষেত্রে কাজের বিভিন্ন সুবিধা (নিরাপদ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নিশ্চিত করা), শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা, স্বাস্থ্য সম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা, প্রবেশন কাল (Probation Period), ছুটি নিশ্চিত করা, ক্ষতিপূরণের অধিকার ইত্যাদি অধিকার সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া মানবাধিকার বিধিমালার (১৯৪৮ সালে গৃহীত এবং বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত) ধারা ৭, ৮, ১১, ১২ এবং ধারা ২০ থেকে ধারা ২৫, যা যে কোনো শ্রমজীবীর বাক স্বাধীনতা, সভা সমিতি করার স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণ, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকার, প্রাপ্য মজুরি ও সম্মানী ভাতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যবিহীন সমানাধিকার ইত্যাদি অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত-সেই মানবাধিকার বিধিমালাও জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এসব আইন এবং আইনি কাঠামো থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনগুলো জাহাজভাঙ্গা শিল্পের ব্যাপকতা এবং তার স্বতন্ত্র প্রকৃতির কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলা এবং শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বিদ্যমান আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগও করা হয় না। ফলে এ শ্রমঘন শিল্পটি অনাবশ্যকভাবে সংশিণ্টষ্ট সকলের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকদের অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি এবং প্রাণনাশই নয়, এ শিল্প বন উজাড় করছে, এমনকি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী পুন:স্থাপনকারী বনায়নের নির্দেশও পালন করছে না।

এ প্রসঙ্গে আমরা জাহাজভাঙ্গা শিল্পের একজন প্রাক্তন শিল্পোদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, যিনি এ শিল্পের কিছু সাধারণত অপ্রকাশ্য তথ্য দিয়ে আমাদের গবেষণায় সাহায্য করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাটি আরও একটি কারণে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ সেটি হলো বর্তমানে তিনি এ শিল্পের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত না থাকলেও একটি বিনিয়োগকারী ব্যাংকের প্রধান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কর্মকা"কে অর্থায়ন করার জন্য ইয়ার্ড মালিকদের ঋণ প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া তিনি একটি নির্মাণ শিল্পের প্রধান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও জানেন জাহাজভাঙ্গা শিল্প নির্মাণ শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসেবে কত গুর"ত্বপূর্ণ। এই শিল্পোদ্যোক্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এসেছে সেগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে কোনো লৌহ আকরিক না থাকায় লৌহের জন্য জাহাজভাঙ্গা শিল্পের ওপর প্রায় এককভাবে নির্ভর করতে হয়। ফলে এই শিল্পটি একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছে।

২. জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বিকাশ এবং এর মুনাফার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান জাহাজভাঙ্গা শিল্পের বিকাশের সহায়ক হলেও শ্রমঘন এ খাত উপযুক্ত প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের অভাবে যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ।

৪. যেহেতু এ শিল্প অন্যান্য অনেক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেহেতু এর যথাযথ বিকাশের বিকল্প নেই। সুতরাং সংশিণ্টষ্ট সকলকে এ শিল্পের আধুনিকায়ন, প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে পরিবেশ এবং শ্রমিকের জীবনের উপর এই শিল্পের নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে সুদূর প্রসারী এবং সক্রিয় নীতিগত ও ব্যবহারিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

৪। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই শিল্পের ইতিবাচক প্রভাব এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে উলেণ্টখযোগ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পোদ্যোক্তাদের উচ্চ মুনাফার উপর উচ্চ আয় করের (Tax) মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, সহজ ও সুলভে কাঁচামাল সরবরাহ করে গৃহায়ন ও নির্মাণ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন, গৃহসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি যা অর্থনৈতিক মূল্যায়নে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বেশ খানিকটা জুড়ে আছে। এই শিল্পের নেতিবাচক প্রভাবগুলোর বিষয়ে ইতোমধ্যেই বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এসব নেতিবাচক প্রভাবের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন কঠিন যেহেতু এই প্রভাবগুলোর বাজার মূল্য নেই। কিন্তু এগুলোর non-market value অপরিসীম। এদের মূল্যায়নের (Valuation of non-market goods) জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপায়ও (Economic techniques) রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে অর্থনীতির উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ইতিবাচক প্রভাবের যেরকম অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনি বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপায় ব্যবহার করে নেতিবাচক প্রভাবেরও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের মাধ্যমে অর্জিত আয় বা এ শিল্পের ইতিবাচক দিকটি নির্ণয় করতে যেসব চলক (Variable) বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো *কোম্পানির লভ্যাংশ, শ্রমিক ভাতা এবং বেতন, সরকারকে প্রদানকৃত ট্যাক্স, স্টীলের আমদানি মূল্যের উপর অর্থ সাশ্রয় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ হতে আয়। নেতিবাচক* দিকটি নির্ণয় করার জন্য যেসব চলক (Variable) বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো *দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশগত দূষণ।* নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের নেট লাভকে (Net Profit) ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে:

সমীকরণ (১)

কোম্পানির লভ্যাংশ + শ্রমিক ভাতা এবং বেতন + সরকারকে প্রদানকৃত ট্যাক্স + স্টীলের আমদানি মূল্যের উপর অর্থ সাশ্রয় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে আয় - দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি - পরিবেশগত দূষণ = এই শিল্প দ্বারা অর্জিত অর্থ।

কোম্পানির লভ্যাংশ, শ্রমিক ভাতা এবং বেতন, সরকারকে প্রদানকৃত ট্যাক্সের পরিমাণ

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের উপর ইপসা (YPSA) কর্তৃক পরিচালিত একটি বেসলাইন সার্ভের (YPSA 2005) তথ্য এবং আইএলও (ILO 2003) প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে সমীকরণ (১)-এর চলকগুলো সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এই উৎস দুটির তথ্য অনুযায়ী জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কোম্পানির লভ্যাংশ বাবদ বছরে ২০ বিলিয়ন টাকা আসে। এই শিল্পের মোট নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ২০,২৬৮ জন। প্রায় ২,৪৭০ জন দক্ষ শ্রমিক গড়ে দৈনিক ১২০ থেকে ১৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। একজন দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক গড়ে দৈনিক ১৪০ টাকা। বাকি ১৭,৭৯৮ জন শ্রমিক, যারা অদক্ষ তাদের পারিশ্রমিক সবসময় দৈনিক ৮৩ টাকা। নিম্নোক্ত সারণিতে দিনপ্রতি শ্রমিকের পারিশ্রমিক উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

সারণি ২

জাহাজভাঙ্গা শিল্পে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি (টাকায়)

	দক্ষ	অদক্ষ	মোট
মোট শ্রমিক	২,৪৭০	১৭,৭৯৮	২০,২৬৮
দৈনিক গড় মজুরি	১৪০.০০	৮৩.০০	৮৯.৯৫
দৈনিক মোট মজুরি	৩,৪৫,৮০,০০০	১৪,৭৭,২৩,৪০০	১৮,২৩,০৩,৪০০

উৎস: ILO Report 2003।

যদি ধরে নেওয়া হয়, বছরে প্রতি শ্রমিকের গড় কর্মদিবস = ৩০০ দিন (সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি এবং আপদকালীন ছুটি বাদ দিয়ে) তাহলে বছরে শ্রমিক কর্তৃক অর্জিত মোট মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায় = ১৮,২৩,০৩,৪০০ টাকা x ৩০০ দিন = ৫৪,৬৯,১০,২০০ টাকা, যা প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন টাকা।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প মালিকদের দাবি অনুযায়ী তারা বছরে ৯.৩৫ বিলিয়ন টাকা সরকারকে আয়কর হিসেবে প্রদান করেন। কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর রিপোর্টে (২০০৫) প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই সংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারের কর ও ভ্যাট সংগ্রহের নীতিও সেই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে এই শিল্প থেকে প্রায় এক বিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ আয়কর থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। ইপসার বেসলাইন সার্ভে (২০০৫) অনুযায়ীও এ শিল্প থকে বাৎসরিক ৭ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর হিসেবে আয় করে থাকে।

স্টীলের আমদানি মূল্যের উপর অর্থ সাশ্রয়ের পরিমাণ

জাহাজভাঙ্গা শিল্প প্রতি বছর ১.৮ মিলিয়ন টন স্টীল উৎপাদন করে। রি-রোলিং মিলে ব্যবহৃত প্রতি টন আমদানিকৃত স্টীলের মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা যা ২০০৯ সালের মূল্য অনুযায়ী প্রায় ৭০০ মার্কিন ডলারের সমান (বর্তমান বিনিময় হার হলো: মার্কিন ডলার = ৭১.১৪ বাংলাদেশী টাকা)। ঐ একই বছরে (২০০৯) জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প থেকে প্রাপ্ত প্রতি টন স্টীলের দাম ছিল চলিণ্ঢশ হাজার টাকা (৪০,০০০)। সুতরাং প্রতি টনে টাকা ১০,০০০ (৫০,০০০-৪০,০০০) বাঁচনোর মাধ্যমে ১.৮ মিলিয়ন টন স্টীলে এ শিল্প দ্বারা অর্জিত লভ্যাংশের পরিমাণ = ১.৮x১০,০০,০০০x১০,০০০ = টাকা ১৮,০০,০০,০০,০০০ = ১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

নেতিবাচক প্রভাবের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

সাধারণত কোনো ধরনের পূর্ব সচেতনতা বা প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রবণতা খুব বেশি। হাজার হাজার শ্রমিক বিষাক্ত পদার্থের কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুখে আক্রান্দড় হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে প্রায়শই জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক আহত বা নিহত হবার (casualty) ঘটনা প্রকাশিত হয়। যার অনেকগুলোই সঠিকভাবে নথিভুক্ত (Reported) হয় না। প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী গত ২০ বছরে ৪০০ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে এবং ৬,০০০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে (YPSA 2005)। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। কেননা এক একটি দুর্ঘটনাতেই ১০ থেকে ৫০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হতে পারে। যেমন, ৩১ মে ২০০০ সালে ইরানিয়ান ট্যাঙ্কার টি টি ডেনা বিস্ফোরিত হয়ে ৫০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

YPSA'র তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে প্রতি সপ্তাহে গড়ে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং প্রতিদিন একজন শ্রমিক আহত হয় (YPSA 2005)। তবে এই শিল্পের মালিকদের দ্বারা এই তথ্য স্বীকৃত নয়, এমনকি এই সম্পর্কিত কোনো তথ্যও তাদের রেকর্ডে নেই। YPSA এবং বিভিন্ন মিডিয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ডাটা গ্রহণ করা যেতে পারে:

প্রতি বছর দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু (আনুমানিক) = ৫০

মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণে মারাত্মকভাবে আহত হয় প্রতি বছর (আনুমানিক) = ৩০০

অর্থনীতির মানদন্ড দ্বারা মৃত্যু ও দুর্ঘটনার মূল্য পরিমাপ করা কঠিন। কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনার ফলে কেউ মারাত্মকভাবে আহত হয়, তাহলে সে ক্ষতির পরিমাণ ধরা হবে ৫০০ হাজার টাকা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই পরিমাণ ধরা হবে। এই পরিমাণ অর্থ ক্ষতি দিয়ে দুর্ঘটনার মূল্য পরিমাপ করলে প্রতি বছর দুর্ঘটনার কারণে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১৭৫ মিলিয়ন টাকা।

YPSA'র তথ্য মতে, জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে শ্রমিকরা পাঁচ বছর কাজ করার পর ভারী কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই সময়ের পর একজন শ্রমিক তুলনামূলকভাবে কম পরিশ্রমের কাজ করে এবং বছরে কম দিন কাজ করতে পারে। YPSA-এর জরিপের তথ্য অনুযায়ী কম শ্রমের কাজে একজন শ্রমিক দৈনিক গড়ে ১০ টাকা করে মজুরি হারায়। আবার এ সব শ্রমিকের বাৎসরিক কর্মদিবস গড়ে ৩০০ দিন থেকে ৫০ দিন কমে ২৫০ দিন হয়ে যায়। সুতরাং প্রতি বছর গড় হ্রাসকৃত মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০টাকা x ২৫০ = ২,৫০০ টাকা।

ইয়ার্ডের শ্রমিকদের গড় বয়স হচ্ছে ১৮-২২ বছরের মধ্যে। অথচ বাংলাদেশের শ্রমিকদের গড় বয়স ৪৫ বছর। ফলে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিকেরা ভারী কাজে অসমর্থ হিসেবে বাকি ২৩ বছর অতিক্রান্দড় করবে কম মজুরিতে। এখানে তার পুরো শ্রমিক জীবনে মজুরি ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৩x২৫০০=৫৭,৫০০ টাকা। গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ ধরনের ক্ষতি প্রতি ৫ বছরে অন্দড়ত একবার হয়। ফলে শ্রমিকের বাৎসরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হচ্ছে প্রতি বছর ১১,৫০০ টাকা। এই হিসাবে ২০,০০০ শ্রমিকের জন্য মোট স্বাস্থ্য ঝুঁকির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি বছর ২৩০ মিলিয়ন টাকা। সুতরাং প্রতি বছর শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও দুর্ঘটনার মোট মূল্য হচ্ছে ৪০৫ মিলিয়ন টাকা।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে নি:সৃত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থসমূহের কারণে পরিবেশের যে দূষণ হয় তার প্রভাব ব্যাপক। যেমন সামুদ্রিক দূষণের ফলে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের ওপর অত্যন্দড় ক্ষতিকারক

প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশ বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙ্গা শিল্প এলাকা চট্টগ্রামে মৎস্য আহরণের পরিমাণ গত কয়েক বছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে এই হ্রাসের জন্য সামুদ্রিক দূষণ একটি প্রধান কারণ। মৎস্য আহরণের উপর সামুদ্রিক দূষণ কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা নির্ণয়ের জন্য কেবল ইলিশ মাছ আহরণ বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। ইলিশ মাছ আহরণের মোট পরিমাণের উপর জাহাজভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা (control area) খুলনায় বিগত কয়েক বছরে আহরিত ইলিশ মাছের পরিমাণের সাথে ঐ একই সময়ে চট্টগ্রাম এলাকায় কত পরিমাণ ইলিশ মাছ আহরিত হয়েছে তার তুলনা করা হয়েছে। এই দুই এলাকায় মোট আহরিত সামুদ্রিক মৎস্যের পরিসংখ্যানও নেওয়া হয়েছে। সারণি ৩-এ খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বার্ষিক মাছ ধরার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, চট্টগামে মোট মাছ আহরণের পরিমাণ ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ড় মোটামুটি বাড়লেও ২০০৪-০৫ সালে তা প্রথম বছরের চেয়েও হ্রাস পেয়েছে। ইলিশের আহরণ আরও আশঙ্কজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু খুলনার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে মাত্র একটি বছর (২০০২-২০০৩) ছাড়া প্রতি বছরই মাছের আহরণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার চমকপ্রদ। সারণিটি হতে আরও দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে খুলনায় ইলিশের আহরণ ০ মেট্রিক টন দিয়ে আরম্ভ করে ২০০৪-২০০৫ সালে এসে ৩৫০ মেট্রিক টনে পৌঁছে। অপরদিকে চট্টগ্রামে ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ইলিশের আহরণ যেখানে ১১৩ মেট্রিক টন ছিল ২০০৪-২০০৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২০ মেট্রিক টনে।

সারণি ৩

খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বার্ষিক মাছ ধরার তুলনামূলক চিত্র

বছর	চট্টগ্রাম		খুলনা	
	ইলিশ (মেট্রিক টন)	মোট (মেট্রিক টন)	ইলিশ (মেট্রিক টন)	মোট (মেট্রিক টন)
১৯৯৮-১৯৯৯	১১৩	১৪৫১	০	৩৪৪
১৯৯৯-২০০০	১৪৩	১৫৯২	৮৬	৩০৮
২০০২-২০০৩	০	১৫০৪	১২০	২৬৮
২০০৩-২০০৪	১৫	১৬৮৮	৩১০	৪৯৭
২০০৪-২০০৫	২০	১১০৬	৩৫০	৫৬৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৪ ও ২০০৬।

এই তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, খুলনা এলাকায় জাহাজভাঙ্গা শিল্প না থাকায় ইলিশ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে চট্টগামের মতো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। গত ৪ বছরে চট্টগ্রামে ইলিশ মাছ যে পরিমাণ আহরণ কমে গেছে তার বাজার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২৪ মিলিয়ন টাকা যা জাহাজভাঙ্গা শিল্পের অর্থনৈতিক অর্জন থেকে বাদ দিতে হবে। এই তথ্য থেকে যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাবে না যে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কারণেই চট্টগ্রামে মাছ ধরার পরিমাণ কম, তবে বিষয়টি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা দরকার।

পরিবেশগত দূষণের কারণে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন কেননা এ সম্পর্কিত তথ্য সহজে পাওয়া যায় না, এমনকি কনভার্শনের অনুপাত নির্ণয়েরও কোনো সঠিক মানদ — নেই। কিন্তু বাংলাদেশ

এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন (BELA)[৩] এর তথ্য মতে প্রতি বছর পরিবেশগত দূষণের মোট মূল্য প্রায় ১ বিলিয়ন টাকা। জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মোট সংযোজিত মূল্য নির্ণয় করার জন্য এই তথ্যটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

সমীকরণ– (২)

জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মোট সংযোজিত মূল্য = ২০ বিলিয়ন + ০.৫৫০ বিলিয়ন + ৭ বিলিয়ন + ১৮ বিলিয়ন - ০.৪০৫ বিলিয়ন - ১ বিলিয়ন = ৪৪.১৪৫ বিলিয়ন টাকা।

মূল্য বণ্টন

এই শিল্পের অংশীদারদেরকে ৫টি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে যেমন, (১) জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের মালিক গ্রুপ, (২) ইয়ার্ডের শ্রমিক গ্রুপ, (৩) সরকার, (৪) পরিবেশ, এবং (৫) স্টীল রি-রোলিং ইন্ডাস্ট্রি। এই অংশীদারদের মধ্যে মোট ৪৪.১৪৫ বিলিয়ন টাকার বণ্টন সারণি ৪-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৪

জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে অংশীদারদের লাভ ক্ষতির পরিমাণ

অংশীদারগণ	ইতিবাচক (টাকা)	নেতিবাচক (টাকা)	মোট (টাকা)	মন্তব্য
মালিক	২০ বিলিয়ন		২০ বিলিয়ন	লাভ
কর্মচারী	৫৫০ মিলিয়ন	৪০৫ মিলিয়ন	১৪৫ মিলিয়ন	শ্রমিকের মজুরি লাভ এবং শ্রমিকের দুর্ঘটনা এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি
সরকার	৭ বিলিয়ন		৭ বিলিয়ন	কর ও ভ্যাট
স্টীল রি-রোলিং শিল্প	১৮ বিলিয়ন		১৮ বিলিয়ন	কাঁচামালের মূল্যহ্রাস
পরিবেশ		১ বিলিয়ন	(১ বিলিয়ন)	পরিবেশ দূষণের ব্যয়

মোট মূল্য বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই জাহাজভাঙ্গা শিল্প টিকে থাকার যোগ্য। উপরের হিসাব মতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই শিল্পের অবদান প্রায় ৪৫ বিলিয়ন টাকা। কিন্তু এই মূল্য বণ্টনে মালিকপক্ষ পক্ষপাতিত্ব করছে। মালিক পক্ষ প্রতিবছর প্রায় ২০ বিলিয়ন টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু পরিবেশগত দূষণের কারণে প্রতিবছর প্রায় ১ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হয় জাতীয়ভাবে। দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির ব্যয়সহ শ্রমিকরা পেয়ে থাকে প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন টাকা। আর এ খাত হতে সরকার ৭ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আয় করছে। সুতরাং এই বিশেণ্ডষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পরিবেশগত দূষণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অর্থনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না, কারণ জাহাজভাঙ্গা শিল্পে লভ্যাংশের মাত্রা অনেক বেশি।

৫। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যয় ও মুনাফা

[৩]বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বেলা ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিবেশবাদী সংগঠন যা পরিবেশ সংক্রান্ড় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিরলসভাবে বাংলাদেশে পরিবেশগত আইনি কর্মকা- পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ড় জনস্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মালিকগণ প্রতিবছর প্রায় ২০ বিলিয়ন টাকা লাভ করলেও প্রায়শই শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তা থেকে ব্যয় করতে আগ্রহী হন না। অথচ এই শিল্পের ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যয় আসলে সংশিণ্টষ্ট সকলেরই উপকার করে। কিছু ক্ষেত্রে এই লাভের পরিমাণ ব্যয়ের পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি হয়। প্রবন্ধের এ অংশে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং সংশিণ্টষ্ট লাভের আর্থিক মূল্য পরিমাণ করার প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে।

৫.১। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে পেশাগতনিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যয় ও লাভ

পেশাগত নিরাপত্তা বিধানের জন্য খরচ এবং তা থেকে লাভের পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক ILO'র নির্দেশিকাসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক ILO'র নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩ সালের মে মাসে। এই নির্দেশিকা বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে এটি মেনে চললে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। ILO'র নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধকমূলক পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ঝুঁকি বর্জন।

খ) ঝুঁকির উৎস নিয়ন্ত্রণ, মেশিনারী ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ।

গ) নিরাপদ কর্মপদ্ধতি দ্বারা ঝুঁকি হ্রাস করা, যা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।

ঘ) যেখানে সমন্বিতভাবে কোনো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন যন্ত্রাদির মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

প্রথম তিনটি পদক্ষেপ কার্যকর করার জন্য সময়,অর্থ এবং সর্বোপরি নিরাপদ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য শ্রমিকের দক্ষতার প্রয়োজন কিন্তু বর্তমানে এগুলোর প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনীহা, সঠিক তথ্যের অভাব ইত্যাদি কারণেও এ পদক্ষেপগুলো কার্যকর করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সঠিক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে পেশাগত নিরাপত্তা দ্রুত বাস্ড়বায়ন সম্ভব। কর্মচারীদের প্রয়োজনের দিকে মালিকপক্ষের সুদৃষ্টি থাকলেই তা সম্ভব। শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার পদক্ষেপটি আরও দ্রুত বাস্ড়বায়ন সম্ভব যদি মালিকপক্ষ সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ হতে উদ্ভূত লাভের অঙ্কটি সম্বন্ধে সচেতন হন। তাই এখানে শ্রমিককে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার ফলে উদ্ভূত লাভের পরিমাণ নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সরঞ্জামের মূল্য আন্ড়র্জাতিক মূল্যে নিরূপণ করা হয়েছে। ব্যয় এবং লাভ সম্ভাব্য আর্থিক মূল্যে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে । সারণি ৫-এ জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ এবং এগুলোর মূল্য ও ব্যবহারের মোট বার্ষিক খরচ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৫

জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ, এগুলোর মূল্য এবং এগুলো ব্যবহারের বার্ষিক খরচ

সরঞ্জামাদি	মোট প্রয়োজনীয় সংখ্যা	সরঞ্জামাদির কর্মক্ষমতার সময়সীমা	প্রতি ইউনিটের মূল্য (টাকা)	প্রতি বছর মোট ব্যয় (টাকা)

		(বছর)		
গণ্ডাভস	১০,০০০	১	৩০০	৩ মিলিয়ন
হেলমেট	১০,০০০	৫	৫০০	১ মিলিয়ন
বুট	১০,০০০	২	৫০০	২.৫ মিলিয়ন
নিরাপদ গণ্ডাস	৫,০০০	৫	২০০	০.২ মিলিয়ন
ইউনিফর্ম	২০,০০০	২	৩০০	৩ মিলিয়ন
নিরাপদ দড়ি এবং জাল	৩৬	১০	১০০,০০০	.৩৬ মিলিয়ন
নিরাপত্তা বেল্ট	১০,০০০	২	৩৫০	১.৭৫ মিলিয়ন
বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী	৩৬	৫	১০,০০,০০০	৭.২ মিলিয়ন
গ্যাস মাস্ক	১,০০০	২	২,৮০০	১.৪ মিলিয়ন
তেলের স্ড়র নির্দেশক	৭২	৫	৫০,০০০	.৭২ মিলিয়ন
অক্সিজেন মাস্ক	২০০	৪	৩,৫০০	.১৭৫ মিলিয়ন
অক্সিজেন সিলিন্ডার	২০০	১	৫,০০০	১ মিলিয়ন
প্রশিক্ষণের জন্য খরচ	২০,০০০	১	৫০০	১০ মিলিয়ন
মোট	-	-	-	৩২.৩০৫ মিলিয়ন

উৎস:

সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিককে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য মালিকদের বছরে মোট ৩২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হবে। আর পূর্বের তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে মালিকদের লাভের অঙ্কের পরিমাণ হলো ২০ বিলিয়ন টাকা। এ ক্ষেত্রে মোট লাভ ২০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ইয়ার্ডের মালিকদের জন্য ৩২ মিলিয়ন টাকা খুব কম খরচ। লাভের মাত্র এক সহস্রাংশ খরচ করে মালিকরা শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। পূর্বোক্ত হিসাবের তুলনায় এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অতি নগণ্য, কেননা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা যায় না। নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করে যদি দূর্ঘটনার মাত্রা ৮০ শতাংশের মধ্যে রাখা যায়, তাহলে দুর্ঘটনার জন্য যে খরচ হবে তার ৮০ শতাংশ কমানো যাবে। আর এ প্রেক্ষিতে হ্রাসকৃত খরচের পরিমাণ হবে: ১৭৫ মিলিয়ন x ৮০% = ১৪০ মিলিয়ন টাকা এবং নিরাপত্তা পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে বছরে মোট অর্থনৈতিক লাভের পরিমাণ হবে: (১৪০ - ৩২.৩০৫) মিলিয়ন টাকা = ১০৭.৬৯৫ মিলিয়ন টাকা, যা নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ খরচের ৫ গুণেরও বেশি।

৫.২। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে পরিবেশ রক্ষা আইনের প্রয়োগের ফলে ব্যয় ও লাভ

পরিবেশ রক্ষা আইন প্রয়োগ না করার ফলে লাভের প্রাপ্তি

বর্তমানে বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মালিকগণ পুরোনো জাহাজ কেনে প্রতি টন ২৪০ ডলার থেকে ৩০০ ডলার হিসাবে যেখানে তুর্কী ক্রেতারা পুরোনো জাহাজ কেনে প্রতি টন ৪০০ ডলার থেকে ৫০০ ডলার হিসাবে। তুর্কী ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান ক্রেতারা সেসব জাহাজ কেনে যেগুলো দূষিত পদার্থমুক্ত। যদি তারা দূষিত পদার্থযুক্ত কোনো জাহাজ কেনে তবে জাহাজের মালিকদের জাহাজ পরিষ্কার করার ভার নিতে হয় বা খরচ বহন করতে হয়। বাংলাদেশ দূষণমুক্ত ও দূষণযুক্ত দুই ধরনের জাহাজই কিনে থাকে। দূষিত জাহাজ কেনার ফলে যে অর্থনৈতিক প্রাপ্তি তা হলো একেক জনের উপর ১০০ ডলার যা জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মালিকরা পান কম খরচ হিসেবে। জাহাজভাঙ্গা শিল্প হতে বছরে যে

স্টীল বা ইস্পাত পাওয়া যায় তার পরিমাণ ১.৮ মিলিয়ন টন। কাজেই কম দামের জন্য সর্বমোট প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১০০x৭০x১.৮ মিলিয়ন টন = ১২.৬ বিলিয়ন টাকা (উলেণ্টখ্য ১ ডলার = ৭০.০০ টাকা)

পরিবেশ রক্ষা আইন প্রয়োগ না করার ফলে ব্যবসা হারানোর ঝুঁকি

ইউরোপিয়ান দেশগুলো পরিবেশ দূষণের বিষয়ে অত্যন্ড় সতর্ক। সেদেশের সরকারসমূহ এই মর্মে বিভিন্ন আইন পাশ করেছে যাতে সেসব ইয়ার্ডে পুরোনো জাহাজ আমদানি না করা হয় যেখানে পরিবেশ সংক্রান্ড় নিয়মকানুন মানা হয় না। সবুজ জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড বা নিরাপদ জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে ইউরোপের দেশগুলোতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

ম্যারিন হিস্টোরী ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ গ্রুপ (Marine History Information Exchange Group) একটি খবরে উলেণ্টখ করেছে যে, ডাচ্ (Dutch) সবুজ স্ক্র্যাপইয়ার্ড ৭৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে যার মাধ্যমে তারা শূন্য দূষণ (Zero Pollution) বিশিষ্ট ইয়ার্ড স্থাপন করতে যাচ্ছে নেদারল্যান্ড এর উত্তরে এমস্যাভেন (Emshaven)-এ। এটি আরও উলেণ্টখ করেছে যে, এর প্রভাব বাংলাদেশ ও ভারতের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের উপরও যেমন পড়বে তেমনি বাংলাদেশ ও ভারতের জাহাজভাঙ্গা শিল্পেও অবস্থার উন্নতি হবে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পরিবেশ রক্ষা আইন না প্রয়োগের ফলে যে প্রাপ্তি তা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

৬। উপসংহার

জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শুরু বাংলাদেশে যেভাবেই হোক না কেন এখন পর্যন্ড় এটি মোটামুটিভাবে একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। মোটামুটি বলার কারণ হলো একটি সুগঠিত শিল্প হতে গেলে যে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, নিয়মকানুন ও তার বাস্ড়বায়ন দরকার তার কোনোটিই এ শিল্পে নেই। তার থেকেও বড় কথা হলো যেখানে একটি শিল্প একটি দেশকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য গড়ে উঠে সেখানে জাহাজভাঙ্গা শিল্প বাংলাদেশেকে তাৎক্ষণিক লাভের মুখ দেখালেও ফেলে দিচ্ছে ভবিষ্যতের ভয়াবহ অন্ধকার কূপে। কারণ একটি দেশের জন্য তার পরিবেশ ও জনগণ অমূল্য সম্পদ। যাদের উন্নয়নের জন্য শিল্পের আবির্ভাব ঘটে, জাহাজভাঙ্গা শিল্প তাদের অস্ড়িত্বকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে শিল্পমালিক ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য। জাহাজভাঙ্গা শিল্পমালিকদের মতে তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কর প্রদান, অনেক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোকে লৌহ, ইস্পাত ইত্যাদি সরবরাহ করে দেশের উন্নয়নে উচ্চ ইতিবাচক অবদান রাখছেন, আর পরিবশবাদীদের মতে এই অবদান হলো দেশের পরিবেশ ও মানুষের জীবনের বিনিময়ে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙ্গা শিল্প কর্তৃক সংযোজিত মূল্য প্রায় ৪৫ বিলিয়ন টাকা (প্রতি বছরে)। এই তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায়, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের অর্থনৈতিক অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই অবদানের বিপরীতে যে পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে তার প্রভাব কেবল তাৎক্ষণিকই নয় সুদূরপ্রসারীও। অথচ মালিকগোষ্ঠী যদি পরিবেশগত ক্ষতি এবং স্বাস্থ্যগত ক্ষতি দূর করার জন্য এই শিল্প হতে অর্জিত তাদের মুনাফার এক সহস্রাংশ খরচ করে তাহলে এই শিল্পের অবদান বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতো। কারণ বর্তমান প্রবন্ধের তথ্য হতে দেখা যায়, যদি আইএলও এবং অন্যান্য শ্রমিক নিরাপত্তা পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা হয় তবে বাৎসরিক খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩২.৩০

মিলিয়ন টাকা আর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমবে ১০০ মিলিয়ন টাকারও বেশি।

তাই জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তবে বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু কেবল এই শিল্পের মালিকদের উপরই বর্তায় না, এ শিল্পের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলোরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সরকারেরও বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে এই শিল্পের প্রতি। যেমন, জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত না করার পেছনে একটি প্রধান কারণ হলো মানবস্বাস্থ্য, সামুদ্রিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যের অভাব। এখানে সরকারের উচিত এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করা। জাহাজভাঙ্গা শিল্পে কর্মরত ও ভবিষ্যতে কাজ করবে এমন শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সরকার করতে পারে। শ্রমিকের কর্ম নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকার ও জাহাজশিল্প মালিকদের যৌথ প্রয়াসে সম্পন্ন হতে পারে।

আইনের বিষয়টিতে সরকার কিছুটা তৎপর হয়েছে। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন (BELA) ও বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার জাহাজভাঙ্গা শিল্পের জন্য প্রযোজ্য আইন প্রণয়নে অনেকখানি উদ্যোগ নিয়েছে ও নিচ্ছে। এরই ফলে জাতীয় সংসদে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে একটি বিল পাশ হয়। এই বিলটি বিদ্যমান বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষা আইন ১৯৯৫-এ একটি নতুন ধারার সূচনা করে। এ বিল অনুযায়ী, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি যদি পরিবেশ দূষণ বা শ্রমিক স্বাস্থ্যঝুঁকিজনিত কোনো কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকে তবে তাকে শাস্তি হিসাবে ১০ বছরের জেল ও কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। পরিবেশ রক্ষা আইনের এই ধারা যদি কেউ প্রথমবারের মতো লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে ২ বছরের জেল ও কমপক্ষে ২ লাখ টাকা আলাদাভাবে বা একসাথে জরিমানা করা হবে। একাধিকবার আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ লাখ টাকা জরিমানা ও ১০ বছরের জেল (The Daily Star, September 28, 2010)।

এই আইনি পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, হাইকোর্ট সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যে পরিবেশজনিত বর্জ্য পদার্থমুক্তকরণ দলিল (Certificate) ছাড়া কোনো জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে যেন এনওসি (No Objection Certificate or NOC) প্রদান করা না হয়, বিশেষ করে যখন তারা পরিত্যক্ত জাহাজ আমদানি করবে (The Daily Star, অক্টোবর ১২, ২০১০)। আর একটি সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, জাহাজভাঙ্গা শিল্পে যথাযথ আইন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ হাইকোর্ট ভাঙ্গার জন্য কোনো জাহাজ আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে (Dhaka Mirror, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১০)। এদিকে বেলার (BELA) দায়ের করা পিটিশনের নিয়মিত শুনানি হাইকোর্টে চলছে। তাছাড়া উপযুক্ত আইন সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা সরকারকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার জাহাজভাঙ্গা শিল্পের নেতিবাচক দিকটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। তবে বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে কঠোর হতে হবে। আইনি পদক্ষেপগুলো প্রয়োগের ফলে জাহাজভাঙ্গা শিল্প দ্বারা সংযোজিত আর্থিক মূল্য কিছুটা কমবে ঠিকই কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ ও মানব ক্ষতির সম্ভাবনা কমে আসবে অনেকখানি যা জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে অপার সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিণত করবে।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প একটি সম্ভাবনার নাম। এই সম্ভাবনাকে রক্ষা করার জন্য এবং এই সম্ভাবনাকে আরও সম্ভাবনাময় করার জন্য সরকার, মালিক, এনজিও, পরিবেশবাদী, এমনকি এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক সকলেরই উচিত সম্মিলিতভাবে কাজ করা। আজ যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে অনীহা এবং শ্রমিকের কর্ম অবহেলার আত্মবিধ্বংসী প্রভাব যেভাবে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের উপর পড়েছে তাতে করে একদিন জাহাজভাঙ্গা শিল্পই শুধু নয় এর সাথে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অনেক শিল্পের ভবিষ্যতই ঝুঁকিগ্রস্ড় হয়ে পড়বে। তাছাড়া এই আত্মবিধ্বংসী প্রভাব বিদেশী বিনিয়োগ এবং পর্যটন শিল্পের উপরেও পড়বে। কেননা বর্তমানে জাহাজভাঙ্গা শিল্প দ্বারা সংঘটিত পরিবেশ দূষণ ও এ শিল্পে শ্রমিক মৃত্যু এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানবসম্পদ ও এদেশের প্রতি পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে। এ অবস্থা রোধ করতে সংশিণ্টষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এসে জাহাজভাঙ্গা শিল্পকে একটি দূষণমুক্ত ও টেকসই শিল্পে (Pollution free and sustainable Industry) পরিণত করতে হবে। তাহলেই শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক ভাগ্যোন্নয়নে এ শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Alam, K. (2005): *Institutional Aspects of Ship Breaking Industry Bangladesh.,* Working Paper WP044. Program Development Office for Integrated Coastal Zone Management Plan (PDO-ICZMP).

Butler, Richard J., and John D. Worrall (1991): "Claims Reporting and Risk Bearing Moral Hazard in Workers' Compensation." *Journal of Risk and Insuranc,.* 58(2): 191-204.

Carson, B.L., Ellis, H.V. and McCann, J.L. (1987): *Toxicology and Biological Monitoring of Metals in Humans*. Lewis Publishers, Chelsea, Michigan.

Dhaka Mirror (2010): *HC Bans Scrap Ship Import Till Rules Framed*, December 16.

DNV (2001): Decommissioning of Ships– Environmental Standards Ship-Breaking Practicies/ On-Site Assessment Bangladesh – Chittagong. pp 74.

Foster, U. and Wittman, G. (1981): *Metal Pollution in Aquatic Environment*. Springer, Berlin, Germany.

Green Peace (1999): Ships for Scrap II, Steel and Toxic Wastes for Asia, - Worker Health & Safety and Environmental Problems at the Chang Jiang Shipbreaking Yard Operated by the China National Ship Breaking Corporation in Xiagang Near Jiangyin, November.

Green Peace (2001): Ships for Scrap III, Steel and Toxic Wastes for Asia, - Findings of a Greenpeace Study on Workplace and Environmental Contamination in Alang-Sosya.

ILO (2003): "Draft Guidelines on Safety and Health in Ship Breaking." Interregional Tripartite Meeting of Experts on Safety and Health in Ship Breaking for Selected Asian Countries and Turkey Bangkok, 20-27 May 2003. pp101.

ILO (2003): *Draft Guidelines on Safety and Health in Shipping*. Bangkok. 93pp.

Islam, K.L. and Hossain, M.M. (1986): "Effect of Ship Scrapping on the Soil and Sea Environment in the Coastal Area of Chittagong," *Bangladesh. Mar. Poll. Bull*, Vol.17. No.10, pp.462-463.

London Convention (1972): "Specific Guidelines for Assessment of Vessels" Scientific Group, Report LC/SG 24/11, Annex 6, the Twenty-second Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention 1972. Available at http://www.londonconvention.org.

McElroy, J. Brown (2006): Ship Breaking at Alang, India "What is the Right Thing for this Place?" *TIAS 498 Independent Study,* University of Washington, Tacoma.

Nosal, R.M. and Wilhelm, W. J. (1990): **"**Lead Toxicity in the Ship Breaking Industry: the Ontario Experience." *Can-J-Public-Health Jul-Aug,* 81(4): 259-62.

Rivera, A.T.F., Cortes-Maramba, N.P. and Akagi, H. (2003): Health and Environmental Impact of Mercury: Past and Present Experience J. Phys. IV France 107: 1139.

Rahman, A. M. amd Shahin, A.M. (2007): "Shipbreaking Industry in Bangladesh Needs Modernization and Policy Planning," Report of *The Bangladesh Observer*, Dhaka, Friday, November 9.

Siddiquee, N.A. (2004): Impact of Ship Breaking on Marine Fish Diversity of the Bay of Bengal. DFIDSUFER Project, Dhaka, Bangladesh, pp 46.

The Daily Star (2010): "Environment Protection Law: Ship-Breakers to Face 10 Years Jail for Pollution," September 28.

The Daily Star (2010): *Stop Issuing NOC to Import Toxic Scrap Ships,* October 12.

The Dhaka Mirror (2010): "High Court (HC) Bans Scrap Ship Import till Rules Framed", December 16.

YPSA (2005): "Workers in Ship Breaking Industries: A Base Line Survey of Chittagong, Bangladesh." Young Power in Social Action (YPSA), Chittagong. p.79.